সুন্নাহ ও সুস্থতা

শায়খ হুসাইন আবদুস সাত্তার

সুন্নাহ ও সুস্থতা

[শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকার নববী প্রেসক্রিপশন]

শায়খ হুসাইন আবদুস সাত্তার

রূপান্তর

নাদিয়া আফরিন

মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

সম্পাদনা

মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ

উমেদ

প্র কা শ

তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

প্রকাশকের কথা

শায়খ হুসাইন আব্দুস সাত্তার হাফি. ব্যাপারে প্রথম শুনি আমাদের প্রিয় বন্ধু তানভীর রাজের কাছে। সে বারেবার শায়খের লেকচারগুলো বাংলায় বই আকারে আনার ব্যাপারে তাগিদ দিত। নানা কারণে সেই কাজটা করতে বেশ সময় লেগে গেল। তবে আল্লাহর শোকর যে, শেষ পর্যন্ত কাজটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো।

অনেকেরই জানা নেই, শিকাগো ইউনিভার্সিটির প্রিজকার স্কুল অফ মেডিসিনের প্যাথলজির সহযোগী অধ্যাপক ও শিকাগো মেডিকেল সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জিক্যাল প্যাথলজিস্ট এই আলিম শায়খ জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দী হাফি. এর খলীফা। অ্যাকাডেমিক পরিচয় ও কাজের ভিড়ে শায়খ হুসাইন আব্দুস সাত্তার সাহেবের ইলমী ও জীবনঘনিষ্ঠ ইসলাহী বয়ানগুলো অনেকটাই চাপা পড়ে যায়। শায়খের বেশিরভাগ আলোচনাই আত্ম-উন্নয়ন ও ইসলাহে নফস বিষয়ক। লিখিত কিতাবের তুলনায় তার বক্তৃতার পরিমাণ বেশি। হাফিযাহুল্লাহু তাআলা।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, অডিও লেকচারকে লিখিত রূপ দেয়া বেশ কষ্টের কাজ। এখানে প্রথমত দরকার ওই ভাষার দক্ষতা, পাশাপাশি দরকার পূর্ণ মনোযোগের সাথে কাজটা নিখুঁত করার আগ্রহ। এ ছাড়া একটা বক্তৃতার নিজস্ব ঢং থাকে। সেটাকে বইয়ের ভাষায় রূপ দেয়াও বেশ ঝামেলার। এমনকি কাজ শেষেও দেখা যায় পড়ার সময় কিছুটা 'কেমন কেমন লাগা' অবশিষ্ট রয়েই যায়।

এই কঠিন কাজটা করেছেন মোহতারামা নাদিয়া আফরিন ও আমাদের প্রিয় ভাই মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার। উভয় অনুবাদকের কাজই ভালো হয়েছে মাশাআল্লাহ। তবে বক্তৃতার ভাবকে বইয়ের ভাষায় আনতে আমাকেও কিছু ঘষামাজা করতে হয়েছে। শতভাগ সফল না হলেও আশা করছি সামগ্রিকভাবে কাজটা খারাপ হয়নি।

সূচিপত্র

শুরুর কথা ৯
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ১০
অভিযোগ না করা ২৬
ইতিবাচকতা..... ৩০
অর্থ ৩৩
হালাল উপার্জন ৪৪
অর্থ ব্যয় করা ৪৬
অপচয়.....৫০
অর্থ সঞ্চয় ৫৩
সুখ কেনার উপায়.....৫৯
ঋণ পরিহার..... ৬৩
সুদ পরিহার ৬৫
অনাড়ম্বরতা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বর্জন ৬৮
সচ্ছলতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন ৭০
অহেতুক কথা ও কাজ পরিহার..... ৭৯
সামাজিক সম্পর্ক বনাম স্যোশাল মিডিয়া..... ৮৩
ইতিবাচক চিন্তা ও আল্লাহ-কেন্দ্রিক চিন্তা ৮৫
সুন্নাহ ও সুস্থতা.....৮৯
ঘুম ৯৮
ঘুমের ব্যাপারে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা.....১০৬
প্রকৃতি ও সুস্থতা ১৩৭

অভিযোগ না করা

জীবনে কঠিন সময় আসা খুবই স্বাভাবিক। কঠিন সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা খুবই কঠিন। এই সময়গুলোতে যদিও আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত থাকে, তবুও আমাদের জিহ্বা আল্লাহর প্রশংসায় ব্যস্ত রাখা উচিত। আমরা দুনিয়াতে এসেছি পরীক্ষা দিতে। এই পৃথিবী হচ্ছে পরীক্ষাক্ষেত্র এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাকে কঠিন সময়ের মধ্যে ফেলে পরীক্ষা নিতে পারেন। এটাই জীবন। দুঃখ-কষ্ট জীবনের একটি অংশ। কঠিন সময়গুলোতে আমরা কখনো কখনো আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমাদের এই সময়ে খুব সতর্ক থাকা উচিত, যাতে আমরা আল্লাহর প্রতি অভিযোগ না করে ফেলি। আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করলে বরকত কমে যায়। আমরা কষ্ট পেলে, দুঃখ পেলে সেটা প্রকাশ করতে পারব। কিন্তু অভিযোগ করা যাবে না। অভিযোগ করা উচিতও না। বাস্তবে আমরা আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। আপনাকে আপনার দুঃখের অনুভূতি বদলে ফেলতেও বলছি না। শুধু বলছি অনেক কষ্টেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে অভিযোগ না করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি হঠাৎ আমাদের কোনো আপনজন মারা যায়, আমাদের ইতিবাচক থাকা উচিত। কিন্তু এটা বাস্তবসম্মত নয়। এটা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ; বরং এর উল্টোটা ঘটে। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা অভিযোগ না করি। এটা খুব কঠিন বিষয়, কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে। আমাদের বলা উচিত, 'আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহই একমাত্র সত্তা, যিনি সকল সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখেন। হে আল্লাহ, এ ফয়সালা আপনার পক্ষ থেকে এসেছে, এটাই আমার জন্য কল্যাণকর। আপনি আমাকে আমার কষ্ট ভোলার শক্তি দিন।'

আমাদের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা। এমন কোনো সময় কি আছে, যখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলা থেকে বিরত থাকতে পারি? জীবনের যত দুর্যোগ আসুক না কেন তখনো আল্লাহর অনেকগুলো নেয়ামত আমাদের ঘিরে

ইতিবাচকতা

নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا

'কিয়ামত এসে গেছে এমন সময় যদি তোমাদের কারও হাতে একটি গাছের চারা থাকে আর তার পক্ষে কিয়ামতের আগে আগে তা রোপণ করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটি যেন সে রোপণ করে দেয়।' [১৩]

তার মানে খুব কঠিন সময়েও বিচলিত হওয়া যাবে না। আমাদের জীবনে কখনো কখনো দুঃখ-দুর্দশার অভিজ্ঞতা আসতে পারে। এ ধরনের অভিজ্ঞতায় হয়তো আমরা অভ্যস্ত নই, কিন্তু আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। সবকিছুর পেছনেই কল্যাণ আছে এ বিশ্বাস রাখতে হবে। কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দার সামগ্রিক ভালো চান। আমরা হয়তো জানি না কিসে আমাদের কল্যাণ, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন। আমাদের সব সময় ইতিবাচকভাবে ভাবা উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই কঠিন অবস্থাও আল্লাহ পাকই তৈরি করেছেন। তাই আমাদের সকল পরিস্থিতিতেই ইতিবাচক থাকতে হবে।

এই দুনিয়ায় যেটা আমাদের জন্য খারাপ মনে হচ্ছে পরকালে সেটাতেই আমাদের অফুরন্ত কল্যাণ থাকতে পারে। দুনিয়াবি বিষয়ের সাথে পরকালের কল্যাণের তুলনা করা যাবে না। এখন যদি কোনো কিছুতে দুঃখ-কষ্ট বা স্বপ্নভঙ্গ হয়; দেখা যেতে পারে শেষ-বিচারের দিন প্রতিদানস্বরূপ এর চেয়ে অনেক উত্তম কিছু আল্লাহ দান করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

১৩. বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, ৪৭৯। সহীহ।

অর্থ

অর্থ প্রায়ই অতিরিক্ত চাপ ও অশান্তির উৎস হয়ে থাকে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের কমবেশি সবারই হয়, যখন আমরা আর্থিক টানাপোড়েনে থাকি। এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা এবং এমন ঘটনা, যা বারেবার ঘটতে থাকে। হয়তো সবার ক্ষেত্রে সমান না, সবার জীবনে অর্থ একইভাবে প্রভাব ফেলে না, তবে প্রত্যেকেই তাদের জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। আমেরিকান মানসিক সংস্থা (APA) প্রতিবছর আমেরিকানদের মানসিক অশান্তির মূল কারণ ও উপাদান খুঁজে বের করতে তাদের ওপর জরিপ পরিচালনা করে। এ জরিপে ৬০% আমেরিকান বিগত বছরগুলোতে তাদের মানসিক অশান্তির কারণ হিসেবে আর্থিক চাপকেই বড় করে দেখিয়েছেন। অর্থ, সম্পদ ও অর্থনৈতিক সমস্যাই এ দেশে ডিভোর্সের প্রধান কারণ। সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আর্থিক সমস্যা কতটা সাধারণ হয়ে গেছে, আর কত গভীরে প্রবেশ করেছে এই অশান্তি।

ইসলাম সম্পদ ব্যবহারের কিছু নিয়মকানুন নির্ধারণ করে এ সমস্যা সমাধানের সকল পথ বাতলে দিয়েছে। এ সকল নিয়মকানুন অনুসরণ করলে আমরা আমাদের অর্থ-সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে মানসিক শান্তি এবং জীবনের সফলতা উভয়ই অর্জন করতে পারি। দেখুন, যেহেতু ইসলামে সকল সমস্যার সমাধান বিদ্যমান, সুতরাং এখানে সম্পদের সমস্যার সমাধানও আছে। আপনারা জানেন, আমরা মাঝে মাঝে অর্থ-সম্পদ নিয়ে বিপত্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ি, তার কারণ আমরা 'অর্থ' কী ঠিকভাবে তা-ই বুঝি না।

টাকা স্বভাবতই কৌশলপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে টাকাকে শুধু অর্থ-সম্পদ মনে করলে টাকার স্বরূপ বুঝতে পারা খুব কঠিন। এটা বাস্তব বা নির্দিষ্ট কিছু না। যেমনটা আপনারা জানেন, সম্ভবত এক হাজার বছর আগে সম্পদের বাস্তব

সুখ কেনার উপায়

অন্যের জন্য খরচ করলে বা দান করলে সম্পদ কমে না; বরং আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করেন। আমাদের মানসিক শান্তি বাড়িয়ে দেন এবং এর পুরস্কার আখিরাতে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আর এই পুরস্কার এত গুণ বাড়িয়ে দেবেন যে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শিষে এক শ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।’[৪৩]

এই ক্ষেত্রে বলা যায় টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায়। আলোচনায় এর আগেও প্রমাণ করেছি টাকা দিয়ে কোনো কোনো সময় সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি যদি বাস্তবে টাকা দিয়ে সুখ কিনতে চান, তাহলে আপনি আশাহত হবেন। এটার বাস্তব উপায় হলো, অন্যকে দান করা বা অন্যের জন্য ব্যয় করা। এর মাধ্যমে আপনি সুখী হতে পারবেন। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক এই বিষয়ের ওপর একটা গবেষণা করেছিলেন। সেটা ২০০৮ সালে ‘সায়েন্স’ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সায়েন্স’ খুব উন্নতমানের জার্নাল। তারা ভ্যানকুভারে কলেজপড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ওপর এই গবেষণা চালিয়েছিলেন। তারা এলোমেলোভাবে ছেলেমেয়েদের পাঁচ ডলার ও ২০ ডলার দিয়েছিলেন। একদল সেই ডলার দিয়ে নিজের জন্য যা ইচ্ছে কিনেছিল। আরেক দল অন্যদের জন্য উপহার কিনেছিল বা কাউকে কফি খাইয়েছিল বা দান করেছিল, সেটা তাদের পাঁচ বা ২০ ডলারই দেয়া হয়ে থাকুক। গবেষকগণ জরিপ করেছিল তারা টাকা পাওয়ার আগে, টাকা পাওয়ার সময় এবং

৪৩. সূরা বাকারা, (২) : ২৬১

অনাড়ম্বরতা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বর্জন

বিশৃঙ্খলা ও জটিলতর বিষয়সমূহ আমাদের ভেতরে মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাপ সৃষ্টি করে, যা কিনা আমাদের সম্পর্কগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এটি প্রভাব ফেলে। আল্লাহ-বিমুখতার প্রথম ধাপই হচ্ছে মানসিক বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা। আমরা মূলত আলোচনা করার চেষ্টা করব কীভাবে মানসিক বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা বর্জন করা যায় সেটা নিয়ে।

ঘুম হচ্ছে জেগে থাকার বিপরীত অবস্থা। এখন আপনাকে যদি কম জেগে থাকতে বলা হয় বা ঘুমের সময় বাড়িয়ে দিতে বলা হয়, তাহলে আপনি কাজ করার জন্য কম সময় পাবেন। এ অল্প সময়ের মধ্যে আপনি সে কাজগুলোই আগে করবেন যেগুলো দরকারি। তখন অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো থেকে আপনি বিরত থাকবেন। এতে আপনার জীবন সহজ হবে, ঝামেলামুক্ত হবে, সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি জীবনের অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে ভাবনার সুযোগ পাবেন। এখানে মূল কথা হচ্ছে, আমাদের মস্তিষ্ক একটা সময়ে কেবল একটা নির্দিষ্ট বিষয়েই পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে, যদিও একাধিক বিষয়ে মস্তিষ্ক সজাগ থাকতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ক্লাস চলাকালে কেউ একজন যদি কাশি দেয়, তাহলে সেটা আমরা সবাই খেয়াল করি বা শুনতে পাই। কারণ ক্লাসরুম নীরব, সেখানে খুব একটা গোলমাল নেই। আবার ধরুন ক্লাসের বিরতির সময়ে সবাই কথা বলছে, এমন সময় কেউ একজন কাশি দিলে সেটা সবাই এত খেয়াল করবে না বা ধরতে পারবে না। কারণ কেউ মনোযোগী নয়। ক্লাস চলাকালে মস্তিষ্ক মনোযোগী ছিল, তাই কাশি খেয়াল করতে পেরেছে। কিন্তু বিরতির সময় মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত ছিল, তাই শুনতে পায়নি। এ রকমই আমরা যখন বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকি

সামাজিক সম্পর্ক বনাম স্যোশাল মিডিয়া

সম্প্রতি একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব তরুণ অতিরিক্ত ভার্চুয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে, তারা কম ব্যবহার করে এমন লোকদের চেয়ে বেশি একাকিত্বে ভোগে। কিছু মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বেশি সামাজিক হওয়ার আশায়। কিন্তু এটার প্রভাবে সে বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখন বিতর্ক হচ্ছে সত্যিই কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উপকারী না? সামাজিক সম্পর্ক রক্ষায় কোনো অবদান নেই? বিভিন্নভাবে কয়েকটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্যহীনতার সম্পর্ক রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, টুইটার ও এডিএইচডি (ADHD) পরস্পর সংযুক্ত। কেউ যদি অযৌক্তিকভাবে সারাদিন টুইট করতে থাকে, তাহলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তার ADHD আছে।

তা ছাড়া টুইটার ও হৃদরোগের মধ্যেও সম্পর্ক থাকতে পারে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম সত্যিই ক্ষতিকর। আমরা ভাবতে পারি না, আমাদের সন্তানদের সাথে কী হতে চলেছে। একটা সময় হয়তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উপকারী ছিল। কিন্তু সারাজীবন ধরে সেটা উপকারী থাকবে এমন নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন অনেক অপ্রত্যাশিত বিষয়বস্তু প্রবেশ করেছে, যা আমাদের দ্বীনেরও ক্ষতি করছে। আমাদের ধর্মের নীতি হচ্ছে, সামনাসামনি কুশলাদি বিনিময় করা, যাতে পরস্পরের অন্তর কাছাকাছি আসে। উদাহরণস্বরূপ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সাহাবীদের সম্পর্ক অথবা আমাদের সাথে আমাদের শিক্ষকদের সম্পর্ক, যার ইতিবাচক মূল্য আছে।

আমরা আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলো যেমন : পরিবার, কাছের বন্ধু

ঘুম

ঘুম জরুরি। প্রতিটি জীবেরই কোনো না কোনো মাত্রায় ঘুমের দরকার। আসলে এটা সৃষ্টির জন্য এতটাই সহজাত একটি ব্যাপার যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যকারী একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। না তন্দ্রা আর না নিদ্রা, কোনোটাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।'

আমি মনে করি ঘুমের ব্যাপারে এই অসাধারণ বিষয়টি আপনাদের জানা থাকা দরকার। সেটা হচ্ছে :

আল্লাহ তাঁর সত্তাকে যেসব উপায়ে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন তার মধ্যে একটি হলো, তাঁর ঘুমের দরকার নেই, তন্দ্রা বা হালকা ঝিমুনিরও তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। সুবহানাল্লাহ! আপনারা সবাই তো এই আয়াতটি জানেন, তাই না? এটা হচ্ছে বিখ্যাত আয়াত—আয়াতুল কুরসী। এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'না তন্দ্রা আর না নিদ্রা, কোনোটাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।' তাহলে এখানে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এই আয়াত আমাদের এমন একটা রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বড়ত্বকে অনুধাবন করতে পারি। আর সেটা হচ্ছে ঘুম এবং আমাদের ঘুমের চাহিদা। কারণ যখন আমরা আমাদের ঘুমের চাহিদার ব্যাপারটা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারব, তখন আরও ভালো করে বুঝতে পারব, কীভাবে আল্লাহর ঘুম বা তন্দ্রাভাব কোনোটারই বিন্দুমাত্র দরকার পড়ে না। অতএব ঘুম কোনো ছোট বিষয় নয়। এটা এমন একটি বিষয় যেটাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াতের একটিতে উল্লেখ করবার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেকে সমগ্র সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা করে দেখাবার জন্য বেছে নিয়েছেন। তাই ঘুমকে আমাদের বোঝা উচিত।

ঘুমের ব্যাপারে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা

১. প্রয়োজনমাফিক ঘুমানো

ঘুম হচ্ছে সময়ের অপচয়, এটা খুব প্রচলিত একটি ভুল ধারণা। অথচ ঘুম যে শুধু দরকারি তা-ই নয়; বরং ঘুম হচ্ছে একটা নেয়ামত। তাই এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, কতক্ষণ আমাদের ঘুমানো উচিত। কর্পোরেট বিশ্বে একটা কথা খুব চলে, ঘুম দুর্বলদের জন্য। শিকাগো ভার্সিটিতে আন্ডারগ্র্যাডে পড়বার সময় আমরা যেমনটা বলতাম, 'এই সপ্তাহের ঘুমকাতুরে'। কিন্তু বাস্তবতা হলো ঘুম দুর্বলদের জন্য নয়। ঘুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত ও নিদর্শন। কেউ এমন চিন্তা করেও আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করবেন না যে তাদের ঘুমানোর দরকার নেই। কারণ ঘুমের দরকার না হওয়াটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিফাত। এবং এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নিজেকে বর্ণনা করেছেন।

তাই ঘুম দুর্বলদের জন্য নয়, ঘুম জ্ঞানীদের জন্য। এবং চৌদ্দ শ বছর ধরে একজন ব্যক্তির ঘুমের সময়ের সাথে তার জেগে থাকা সময়ের ভারসাম্য হয়ে এসেছে। সাধারণ নিয়ম হলো সতেজ থাকা এবং ক্লান্তি এড়ানোর জন্য প্রয়োজনমাফিক ঘুমানো। এখন তাহলে প্রশ্ন আসে, কতটুকু ঘুম আমাদের দরকার?

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। একজন ব্যক্তির কতটুকু ঘুমের প্রয়োজন সেটার ক্ষেত্রে একটি জিনগত বৈচিত্র্য রয়েছে। দুই নম্বর হলো, একজন মানুষের কতটুকু ঘুমের প্রয়োজন সেটার ওপর আধ্যাত্মিক প্রভাবেরও একটা বিষয় রয়েছে। সুতরাং যারা আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতায় এগিয়ে, দুনিয়ার ফিতনায় কম নিমজ্জিত, তাদের স্বাভাবিকভাবে কিছুটা কম ঘুমেই হয়ে যায়। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তবে তাদেরও একটা প্রাথমিক পর্যায়ের ঘুমের প্রয়োজন হয়। ঘুমের মাধ্যমে শরীর যা চায় সেটা তাদেরও দরকার। তাহলে আপনার কতটা